প্রেমভক্তির আচার্য বিবেকানন্দ

অধ্যাপক সুদর্শন চক্রবর্তী

বিবেকানন্দর ভক্তির কথা চিন্তা করলে স্মৃতিপটে উদিত তাঁর জোড়হাতে দন্ডায়মান মাথায় পাগড়ী, গেরুয়া আলখাল্লা পরিহিত পদ্মপলাশলোচন প্রেমঘন মূর্তিটি - যার দর্শনমাত্র অন্তর শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর রচিত একটি স্তোত্রে স্বামীজী লিখেছেন – ''অদ্বয়তত্ত্ব সমাহিত চিত্তং প্রোজ্জ্বলভক্তি পটাবৃতবৃত্তম।'' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরটি ছিল অদ্বৈতজ্ঞানে সদা সমাহিত, আর বাইরে তিনি উজ্জ্বল ভক্তির আবরণে আবৃত। আর স্বামীজীর সম্বন্ধে বলা হয় – 'তাঁর ছিল অন্তরে ভক্তি আর বাইরে অদ্বৈতজ্ঞানের আবরণ।' শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর গুরুভাইদের সাথে বরাহনগর মঠে থাকাকালীন এক একদিন দেখা যেত রাত্রে তাঁর বালিশ ভেসে গেছে চোখের জলে। এমনই ছিল তাঁর প্রেমরসসিঞ্চিত শ্রীগুরুবিরহের মর্মস্পর্শী তীব্র বেদনা।

ভাবতে অবাক লাগে, যিনি সর্বদা ধ্যানমগ্ন হয়ে আপনাতে আপনি থাকতেই ভালবাসতেন, সেই সপ্তর্ষির ধ্যানসিদ্ধ ঋষিকে কিসের বলে জগতে নামিয়ে আনলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ? নিশ্চয়ই তাঁর অমানুষী প্রেমের বলে। তাঁর সেই দিব্যদর্শনের কথা চিন্তা করুন। সচ্চিদানন্দ সাগরের জমাটবাঁধা শিশু শ্রীরামকৃষ্ণ সপ্রেমে এক সমাধিস্থ ঋষির গলা জড়িয়ে ধরে চোখের ভাষায় নিঃশব্দে মধুর আহ্বান জানালেন – 'আমি যাচ্ছি, তুমিও এসো।' সেই প্রেমে পূর্ণ আহ্বানকে অস্বীকার করতে পারেননি ঋষি। ঋষির অন্তরাত্মারূপী শিশুটি তাঁর প্রেমরজ্জুতে বন্ধন করেই ঋষিকে নামালেন ধরণীর ধুলিতে – সিমলার দত্ত পরিবারের দালানবাড়ীতে। প্রতিটি জীবের প্রতি অপার করুণা ছিল শিশুটির অন্তরে; সেই করুণা সঞ্চারে উদ্বুদ্ধ করেই ঋষিকে জগজনের নিকট প্রেম বিতরণ করার দায়ভার চাপিয়ে দেবার জন্য তাঁকে সুকৌশলে নামালেন জগতে। প্রেমাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অপার প্রেমই ধ্যানী ঋষিকে রূপান্তরিত করল প্রেমিকপ্রবরে – যিনি পরিণত অবস্থায় ঘোষণা করবেন –''বহুরূপে সম্মুখে তোমা ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর / জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।''

বস্তুতপক্ষে অদ্বৈতব্রহ্ম বিজ্ঞানের প্রচারক হলেও বাল্যকাল থেকেই স্বামীজীর ভিতর ভক্তিসত্তার উন্মেষ দেখা গেছে। কমবয়সে সিমলাপল্লীর বাড়ীতে যখন পিত্রালয়ে, তখন থেকেই কখনও রাম-সীতা, কখনও শিবদুর্গা, আবার কখনও বা মহাবীর হনুমানের পূজো করতেন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েও ভাবময় ব্রাহ্মসংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করতেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত অনেক ব্রাহ্মগীতি তাঁর খুব প্রিয় ছিল এবং সেগুলি তিনি ব্রাহ্মদের আসরে অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই গেয়েছেন বহুবার। কিন্তু ব্রাহ্মদের সাথে মেলামেশার ফলে এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনের গভীরে প্রবেশ করে ক্রমে তাঁর সাকার ঈশ্বর অপেক্ষা নিরাকার ঈশ্বরে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিমাপূজাকে প্রথমে তিনি আত্মস্থ করতে পারেননি। কিন্তু জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুর একরাত্রে তাঁকে ভবতারিণী দেবীর মন্দিরে পাঠালেন তাঁদের পরিবারের আর্থিক দুর্দশা দূর করার জন্য দেবীর কাছে পার্থনা জানাতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঠাকুরের নির্দেশে পর পর তিনবার মন্দিরে গিয়ে দেবীর চিন্ময়ীরূপ দর্শনে অভিভূত হয়ে যান এবং প্রতিবার তাঁর নিকট জ্ঞান-বৈরাগ্য-বিবেকলাভের প্রার্থনা জানিয়ে ঠাকুরের নিকট ফিরে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা হয়ে বলে ওঠেন –'নরেন আজ কালী মেনেছে'। সেদিন নরেন্দ্রনাথ সারারাত মাতৃদর্শনের আনন্দে বিভোর হয়ে একটি গান গাইতে থাকেন। সেই বিখ্যাত গানটি হলো ''মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা

পরাৎপরা। / আমি জানি ও দীন দয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুখহরা ....''।

সম্ভবতঃ মা কালীর এই জ্যোতির্ময়ী রূপদর্শনের পর থেকেই ভক্তিপ্রেমের অবরুদ্ধ দুয়ার খুলে স্বামীজীর অন্তরকে শতধারায় প্লাবিত করতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর কথামৃতে বলেছেন – ''লীলা ধরে ধরে নিত্যে গিয়ে লীলায় থাকা তার নাম পাকাভক্তি''। নিজের সাধনার কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন পর্যায়ে কালী, কৃষ্ণ, রামসীতা ইত্যাদি দেবদেবী দর্শন করে ব্রহ্মের সাকার অনুভূতি নিয়ে দিব্যলীলাস্বাদনে মগ্ন থাকেন। কিন্তু তাঁর ইষ্টদেবী মা কালীর ইচ্ছায় ও প্রত্যক্ষ নির্দেশে তাঁকে তোতাপুরী মহারাজের নিকট অদ্বৈতবেদান্তের সাধনা শিখতে হয় এবং অচিরে ঐ সাধনায় সিদ্ধ হয়ে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন ও জীব-জগত ও ঈশ্বরের অভেদত্ব জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। আবার জগন্মাতার ইচ্ছায় সেই নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতভূমি থেকে সামান্য অবতরণ করে 'ভাবমুখে' মায়ের বিচিত্র লীলারস আস্বাদন করতে থাকেন। তিনি যাঁকে উপলব্ধি করেছেন নিত্যে, তাঁকেই আবার বিজ্ঞানীর অবস্থায় দেখেন লীলায়। এটিই হলো পাকাভক্তির অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের অন্যতম মূল সিদ্ধান্তও হলো – 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর'। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁর প্রধান বার্তাবহ স্বামীজীর জীবনেও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবস্থান কালে একরাত্রে তিনি শ্রীগুরুর বিশেষ অনুগ্রহে নির্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছে যান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তর্ধানের পরবর্তী কয়েকটি বৎসরে গভীর ধ্যান ধারণা সহায়ে স্বামীজীও ক্রমশঃ বিজ্ঞানীর অবস্থা লাভ করেন এবং শ্রীগুরুর মতো পাকাভক্তি নিয়ে ভারতে ও বহির্ভারতে যত্রতত্র বিচরণ করেন।

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তি

আপন জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণকে যথার্থ রূপে চিনে নিতে নরেন্দ্রনাথের অবশ্যই কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার শিক্ষানুসারী নরেন্দ্রনাথ বার বার পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করেই তাঁকে 'The latest and the most perfect' অবতার বরিষ্ঠ রূপে জগতের সামনে ঘোষণা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে শিষ্যের সংশয়ভঞ্জনের জন্য চকিতে তাঁর শ্রীমুখের ঘোষণা 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ'– স্বামীজীর অন্তরকে তৎকালে শ্রীগুরুর স্বরূপ উপলব্ধিতে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিল। কিন্তু ভারত পরিব্রাজনকালে আবার সংশয় দেখা দেয়; যোগদীক্ষা নেওয়ার জন্য যান গাজীপুরে পওহারী বাবার নিকট। সেখানেও কিন্তু পর পর বেশ কয়েকদিন রাত্রিকালে ছল ছল সজল নয়নে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান স্বামীজী; হৃদয়ঙ্গম করেন জীবনদেবতার অহৈতুকী করুণা ও নির্দেশ। তারপর থেকেই তিনি নিজেকে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের দাস রূপেই সমর্পণ করেন তাঁর সকরুণ পাদপদ্মে, পরবর্তীকালে তাঁর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রে যা ধ্বনিত হয় নিম্নোক্ত ভাবেঃ-

ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণোড্যো
নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মোহঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।।

সাধারণত পাশ্চাত্যে ও স্বদেশেও স্বামীজী অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্যতিরেকে জনসমক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা কমই বলতেন। বস্তুত তখন স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ এত মহত্তম শিখরে উন্নীত যে পাছে শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে বসেন, সেই ভয়ে অতি-সচেতন না হয়ে তাঁর কথা বলতে সাহস করতেন না। আশ্চর্যের কথা আমরা সাধারণ মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে না বুঝেই কথায় কথায় তাঁর উপমা টেনে আলোচনা করি, আর তাঁর প্রধানতম পার্ষদ স্বামীজী তাঁর

কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। তবুও পাশ্চাত্যে 'মদীয় আচার্যদেব' শীর্ষক তাঁর বক্তৃতা আমরা একটি পাই। তাতে ঠাকুরের জীবন, সাধনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনার মাধ্যমে যুগাবতারের মহিমাকে সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা তিনি করেছেন। আর দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে কয়েকটি বিখ্যাত স্তোত্রও তিনি লিখে গেছেন। হৃদয়ের সমস্ত জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম উজাড় করে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বরূপ ও দিব্যমহিমা উন্মোচরকারী 'শ্রীরামকৃষ্ণ আরত্রিকম' রচনা করেছেন - যার মাধ্যমে আজ বিশ্বের অগণিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত প্রতি সন্ধ্যায় মঠে-মন্দিরে-গৃহে ভক্তিসহকারে তাঁর নিত্য অর্চনা করে চলেছেন। এই স্তোত্রটি স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। তার মধ্য থেকে আমরা তিনটি স্তবক তুলে ধরছি।

১) ভাস্বর ভাব-সাগর, চির-উন্মদ-প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন যুগলচরণ, তারণ-ভব-পার।।
২) বঞ্চন কাম-কাঞ্চন, অতিনিন্দিত–ইন্দ্রিয়রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহপদে অনুরাগ।।
৩) সম্পদ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদ-বারি-যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশরণ, জগজন-দুঃখ যায়।।

আবার স্বরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রম' এও তিনি বলেছেন –

''মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং।
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।''

পূর্বোক্ত বন্দনাগুলির প্রত্যেকটিতেই আমরা দেখছি ভক্ত বিবেকানন্দ শ্রীগুরু পাদপদ্মের মহিমা বর্ণনাপূর্বক তাঁর অভয় চরণাশ্রয় দানের জন্য তার কাছে সকাতরে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। অপর একটি 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রম' -এ তিনি নিঃসংশয়চিত্তে ইদানীং কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ত্রেতায় আচন্ডালে প্রেম বিতরণকারী শ্রীরামচন্দ্র এবং দ্বাপরে গীতার শান্ত মধুর সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণ বলে প্রথিতপুরুষ রূপে ঘোষণা করেছেন।

অবশেষে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ এপ্রিলের একটি চিঠিতে জোসেফিন ম্যাকলাউড-এর কাছে বিবেকানন্দের সেই মর্মস্পর্শী আত্ম-উন্মোচন যাতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি একান্ত শরণাগতির ভাবটি যেন তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হচ্ছে। চিঠিটির অংশবিশেষ তুলে ধরছি।

''আমি ভালই আছি - মানসিকভাবে খুব ভালই। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি-স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ করছি। লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই হল - এখন পুঁটুলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার কর মোর নেইয়া' - হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু।''

যতই যা হোক, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নয় – দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি; আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপর আরোপিত উপাধিমাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি – সেই পুরাতন কন্ঠস্বর! – যা আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত শিহরিত করে তুলেছে। বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, ব্যক্তির প্রতি মায়া-ভালবাসা উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে। নাম-যশ-প্রতিষ্ঠা ঘেরা জীবন তার সব আকর্ষণ নিয়ে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে। কেবল শুনছি প্রভুর সেই আহ্বান! – যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক, তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়।' যাই, প্রিয়তম প্রভু আমার, যাই!

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে – পড়ে আছে সেই বালক, সেই শিষ্য, সেই দাস! ...

যাই! মা, যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ - সেই অশব্দ অজ্ঞাত স্বপ্নরাজ্যে। যার অভিনেতারূপে নয়, কেবলমাত্র দর্শকের মতো। ... যাই, প্রভু, যাই।''

শুনছেন, ঠাকুর যেন তাঁকে বলছেন – আয় আমার কাছে, আর কতদিন থাকবি ? তাই হৃদয় নিংড়ে বলছেন, I come my Lord, I come. I come mother, I come যাই প্রভু যাই, যাই মা যাই।

এককালে যিনি রামকৃষ্ণদেবকে পরীক্ষা করার জন্য শারীরিক ক্লেশ দিতেও দ্বিধা করেননি, সেই সংশয়ী নরেন্দ্রনাথই শরণাগতিতে বিগলিত হয়ে দিলেন তাঁকে 'অবতারবরিষ্ঠ'-এর সার্টিফিকেট। প্রকৃত পক্ষে স্বামীজীর সংশয় তো ভবিষ্যৎ জগৎবাসীকে নিঃসংশয় করার জন্যই; এতো শ্রীরামকৃষ্ণের লীলারই অঙ্গ।

স্বামীজীর মাতৃভক্তি

স্বামীজী মহারাজের মাতৃভক্তিকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। এক - তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের প্রতি ভক্তি এবং দুই - জগজ্জননী মা সারদাদেবীর প্রতি ভক্তি।

(এক) গর্ভধারিণী মা ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রতি স্বামীজীর ছিল অগাধ ভক্তি। এই প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী, উদারমনা, দয়াবতী মায়ের প্রভাব তাঁর জীবনে কম ছিল না। জগদ্ধিতায় আত্মোৎসর্গ ও বৈরাগ্যের প্রেরণায় সংসার ত্যাগী বিবেকানন্দ বিশ্বপথিক হয়ে পরিভ্রমণ করলেও গর্ভধারিণী মায়ের কথা তিনি কখনও ভুলেননি। স্বামীজীর শিষ্য খেতড়ির রাজা অজিত সিংহ যখন তাঁদের দারিদ্র্যপীড়িত পূর্বাশ্রমের জন্য তাঁর মায়ের নামে মাসোহারা হিসাবে কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা নিজের আগ্রহেই স্বীকার করেন, তখন স্বামীজী অন্তরে অত্যন্ত শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করেছিলেন। বিদেশ প্রত্যাবৃত স্বামীজী মাকে আনন্দ দেবার জন্য সন্ন্যাসী হয়েও মাকে নিয়ে কয়েকটি তীর্থে পরিভ্রমণ করেন এবং নিজের অবর্তমানে অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বস্ত গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মায়ের দেখাশোনার দায়ভার দিয়ে যান। গর্ভধারিণী মায়ের প্রতি এই ভক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয় আচার্য শঙ্করের স্বীয় মাতার প্রতি, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের শচীমাতার প্রতি এবং যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতা চন্দ্রমণি দেবীর প্রতি ভক্তির কথা।

(দুই) মা সারদার প্রতি ভক্তি ঃ-

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে প্রধান ত্রয়ী হলেন - রামকৃষ্ণ, সারদা ও বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাগবতী প্রজ্ঞাবলে বিলক্ষণ চিনতেন মা সারদা ও বিবেকানন্দের যথার্থস্বরূপ। যথাসময়ে মা সারদাও চিনলেন পতিদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণকে। কিন্তু যে যুগল-আত্মা সুপ্রাচীনকাল থেকে যুগপ্রয়োজনে ধরাধামে অবতীর্ণ হন ধর্মস্থাপনের জন্য, তাঁদের অন্যতম নরঋষির অবতার নরেন্দ্রনাথ নারায়ণস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনেছিলেন কিছু পরে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পূজিতা জগজ্জননী মা সারদার স্বরূপও। তাই তিনি সারদা দেবীকে শ্রীরামকষ্ণের সঙ্গে অভেদ বলে মনে করতেন। পাশ্চাত্যে যাবার আগে স্বপ্নে যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ পেলেন, তখন তিনি নিশ্চিত হতে পারেননি - তাঁর বিদেশ যাত্রা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কিনা। তখন তিনি ভাবলেন – 'আচ্ছা, শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরের অংশস্বরূপিণী; তাঁকে একখানি পত্র লিখলে হয় না ? তিনি যেরূপ বলবেন, সেরূপই করব'। মায়ের অনুমতি সহ পত্রটি পাবার পর স্বামীজী নিশ্চিন্ত হলেন, বললেন – 'আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হল; মায়েরও ইচ্ছা আমি যাই।' স্বামীজীর ইংরাজ জীবনীতে আছে, মায়ের অনুমতি

পাবার পর স্বামীজী সমুদ্রতীরে গিয়ে আনন্দে নেচেছিলেন। তিনি তখন ছিলেন মাদ্রাজে। আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) কে একটি পত্রে মাতৃভক্ত স্বামীজী লিখলেন – 'মা ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন ? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। ... এই জন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে ? ... আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা ...। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। ... ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মায়ের হুকুম হলেই বীরভদ্র ভুতপ্রেত সব করতে পারে। ...আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন...। মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, "কো রামঃ ?" ... রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো ... কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।'

১লা মে, ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বলরাম বসুর বাড়ীতে (যা এখন 'বলরাম মন্দি'র নামে সুপরিচিত) স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যদের উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ঐদিনই সভা আরম্ভের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সমবেত গুরুভাইদের উপস্থিতিতে স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে রামকৃষ্ণ সংঘের 'সংঘজননী' বলে নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী উদ্দীপিত কন্ঠে বলেছিলেন – 'শ্রীশ্রীমাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিনী বলে, আমাদের গুরুপত্নী হিসেবে মনে কর ? তিনি শুধু তা নয় রে ভাই, আমাদের এই যে সংঘ হতে চলেছে তিনি তার রক্ষাকর্ত্রী, পালন কারিণী, তিনি আমাদের সংঘ-জননী।'

জীবনের শেষদিকে স্বামীজী একদিন মাকে প্রণাম করে বলেছিলেন – 'মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভুত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই।'

বিভিন্ন দেব দেবী ও অবতার-মহাপুরুষদের প্রতি ভক্তি

একাধারে পরম জ্ঞানী, পরম ভক্ত, পরম যোগী ও মহান কর্মী স্বামীজী তাঁর অতুলনীয় দৈবীপ্রজ্ঞার প্রভাবে সনাতন হিন্দুধর্মের অবিসংবাদী আচার্যরূপে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং হিন্দু ধর্মকেও একটি সর্বজনীন বিশ্বধর্মরূপে জগৎবাসীর সামনে প্রকটিত করেন। হিন্দুধর্মের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা ও শাস্ত্রাদি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি জনসমাজে কিংবদন্তীরূপে প্রচলিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও ভগবান শ্রীবুদ্ধের প্রতি তাঁর ছিল অকুন্ঠ শ্রদ্ধা-ভক্তি। ভারতবর্ষের এই তিন প্রধান জ্যোতিস্তম্ভের মতো কিংবদন্তী অবতার মহাপুরুষের কথা তিনি নানাসময়ে দেশে-বিদেশে বহু মানুষকে শুনিয়েছেন। আমেরিকায় তাঁর মুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য ও গোপীপ্রেমের বর্ণনা শুনে এক আমেরিকান মহিলা সব কিছু ত্যাগ করে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হয়ে উঠেন। ছোটবেলায় তিনি রামসীতার পূজা করতেন। মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃসত্যপালন ও প্রজানুরঞ্জন এবং রামসীতার পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম তাঁকে বরাবরই আকৃষ্ট করতো। তিনি ভারতবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন – রামায়ণ মহাভারতের তিন আদর্শ নারী চরিত্র সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর কথা। আর তিনি নিজে ছিলেন রামভক্ত হনুমানের দাস্যভক্তির একান্ত অনুরাগী এবং সঙ্ঘজীবনে এই দাস্যভাবকে

সকলের মধ্যে সঞ্চার করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কেন্দ্রগুলিতে হনুমানজীর পূজার প্রচলন করে গেছেন।

শিবাবতার স্বামীজীর শিবভক্তি তো ভুবনবিদিত। বরাহনগর মঠে গুরুভাইদের নিয়ে শিবরাত্রির দিন শিবের গান রচনা করে নাচে-গানে মেতে উঠতেন। তাঁর শিব-বিষয়ক দুটি গান হলো –

১) তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম বব বাজে গাল ...

২) হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি। / যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরত্রিক স্তোত্রে তাঁকে শিবজ্ঞানে বন্দনা করার রীতি প্রচলন করেছেন। আরত্রিক ভজনের শেষে 'জয় জয় আরতি তোমার, হর হর আরতি তোমার শিব শিব আরতি তোমার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য পূর্বোক্ত আরত্রিক স্তোত্রটি স্বয়ং স্বামীজী রচনা করেছেন। তাঁর রচিত শিব বিষয়ক স্তোত্র "নিখিল ভুবন জন্মস্থেমভঙ্গ প্ররোহা ..." এবং মাতৃবিষয়ক "অম্বাস্তোত্রম" বিখ্যাত। তাঁর বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ সমন্ধীয় একমাত্র সংগীতটি হলো –

"মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া যানেকো দে..."।

বরাহনগর মঠে সব গুরুভাইদের সাথে একদিন নিজে খোল বাজিয়ে দোতলার উপর হরিনাম সংকীর্তনে এমন মেতে উঠেন যে মনে হয়েছিল বুঝি ছাদটাই না ভেঙ্গে পড়ে। বিদেশ পরিভ্রমনান্তে লাহোর শহরে ভাষণ দেওয়ার পর স্বামীজী লক্ষ্য করেন সেখানকার লোকের অন্তরে তেমন ভাব-ভক্তি নেই। তাই খোল-করতাল সংগ্রহ করে সকলকে নিয়ে সংকীর্তন জুড়ে দেন; ভক্তির বন্যায় সেদিন সকলকে মাতিয়ে দেন বিবেকানন্দজী।

প্রেমাবতার যীশু খ্রীষ্টের প্রতিও ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি। অবতারগণকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা সম্বন্ধে একবার তাঁকে জনৈকা মহিলা প্রশ্ন করলে, তিনি যা উত্তর দেন, তা খুবই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, 'সত্য বলতে কি মহাশয়া, ন্যাজারেথবাসী ঈশার সময়ে আমি যদি জুডিয়ায় বাস করতাম, তাহলে চোখের জল দিয়ে নয়, হৃদয়ের শোনিতে আমি তাঁর পা-দুখানি ধুয়ে দিতাম'।

আর ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর কি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সেকথা ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' নামক বিখ্যাত পুস্তকের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করেছেন। স্বামীজীর জীবনে বুদ্ধের প্রতি ভক্তিই ছিল সর্বপ্রধান বিচারমূলক অনুরাগ। সম্ভবতঃ ভারতের এই মহাপুরুষের জীবনের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যই তাঁকে ঐ বিষয়ে আনন্দ প্রদান করত। তিনি বলতেন, "ধর্মাচার্য গণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদ সম্পর্কেই আমরা প্রকৃত ইতিহাস জানি, কারণ সৌভাগ্য ক্রমে তাঁদের শত্রুমিত্র দুইই ছিল।"

স্বামীজী যখন তরুণ বয়স্ক যুবক নরেন্দ্রনাথ, তখন তাঁদের সিমলার বসত বাটীতে জ্যোতির্ময় মুন্ডিত মস্তকে যে সৌম্যদর্শন মহাপুরুষের অলৌকিক দর্শন লাভ করেন, তিনি হলেন স্বামীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ শ্রীবুদ্ধদেব। তাঁর দুর্বার আকর্ষণে স্বামীজী কাশীপুর উদ্যানবাটী থেকে অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে ফেলে দুজন গুরুভাইকে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় তপস্যা করতে যান এবং অলৌকিক দর্শন লাভে ধন্য হয়ে গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠেন। আবার বিদেশী শিষ্য শিষ্যাদের নিয়ে বুদ্ধগয়ায় যান জীবনের শেষলগ্নে। সেখানে তাঁদের বলেছিলেন, "একি সত্যই সম্ভব, তিনি যে বায়ুতে নিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন, আমিও সেই বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ করছি ? যে ভূমির উপর তিনি বিচরণ করেছিলেন, আমিও তার উপরেই বিচরণ করছি ?"

স্বামী বিবেকানন্দ মূলতঃ সনাতন ধর্মের অন্তর্গত বেদান্তের অদ্বৈতজ্ঞানকেই বিশ্বসমক্ষে প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন এবং ভারতবর্ষের বৈদান্তিক ধর্মই যে এ যুগে বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম তাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাহলে এযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তির আচার্য শ্রীচৈতন্যদেব এবং তৎপ্রচারিত শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত প্রেমধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর মনোভাব কি ছিল তা জানতে আমাদের আগ্রহ হয়। এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে আমরা তাঁর 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

"জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন এই প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়া সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। সাধু-পাপী, হিন্দু-মুসলমান, পবিত্র-অপবিত্র, বেশ্যা-পতিত সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল। সকলকেই তিনি দয়া করিতেন; এবং তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায় ... আজ পর্যন্ত দরিদ্র, দুর্বল, জাতিচ্যুত, পতিত, কোন সমাজে যাহার স্থান নাই এইরূপ সকল ব্যক্তির আশ্রয়স্থল।"

"প্রথমে এই কাম, কাঞ্চন, নাম, যশ এই ক্ষুদ্র সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিস যে সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মূহূর্তে যাহাদের হৃদয়ে কাম কাঞ্চন যশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে, উহার সমালোচনা করিতে যায়। কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা। এমনকি দর্শনশাস্ত্র শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। ... যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, আর কোন লক্ষ্য থাকিবে না, এমনকি তোমাদের সত্যানুসন্ধান স্পৃহা পর্যন্ত থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্তার আবির্ভাব হইবে তখনই তোমরা গোপীদের অহেতুক প্রেমের শক্তি বুঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যখন এই প্রেম পাইলে – তখন সব পাইলে।"

উপসংহার ঃ- শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলেছেন - 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।' জগতে যাঁরা প্রথিতযশা আচার্য, তাঁদের জীবনে আমরা দেখি, তাঁরা সাধনজীবনে অন্তরে যা অনুভব করেন, বাণীদ্বারা তাই প্রকাশ করেন ও শারীরিক প্রচেষ্টায় তাঁর কর্মদ্বারা উদ্‌যাপন করেন। তাঁদের মন-মুখ এক; তাঁরা কায়-মন-বাক্যে অসঙ্গতিশূন্য হয়ে জীবনচর্যা করেন। তাই তাঁদের শিক্ষা জীবন্ত ও ফলবতী হয় জনসমাজে। প্রেমভক্তির আচার্য বিবেকানন্দও অন্যান্য ধর্মাচার্যদের মতো সত্যবস্তুর সাক্ষাৎকারের জন্য সাধনা, অন্তরে উপলব্ধ সত্যকে জগতসমক্ষে প্রচার এবং সেই আচার-প্রচারকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোও তৈরী করে দিয়ে গেছেন। তারই ফলশ্রুতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বর্তমান কর্মধারা হিমালয়ের গোমুখ উৎসারিত গঙ্গা প্রবাহের মতো আবিশ্ব সকলকে বিধৌত করে চলেছে। যুগ প্রয়োজনে স্বামীজী গীতা সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের মতো জ্ঞান-ভক্তি-ধ্যান ও কর্ম এই চতুর্বিধ যোগমার্গকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন যাতে আধার অনুযায়ী বিভিন্ন মানুষ সেগুলি অবলম্বন করে জীবনে পরিপূর্ণতার আস্বাদ পেতে পারেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠ-মিশনে যেমন শ্রীগুরুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন দেবদেবীর পটপূজার প্রবর্তন করে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজা ও সগুণ ভক্তিসাধনাকে মর্যাদা দিয়েছেন, তেমনি শাস্ত্রাদি চর্চা ও বেদান্তের নিরাকার ব্রহ্ম-সাধনার প্রচলনের মাধ্যমে নির্গুণা ভক্তি লাভের পথও

প্রশস্ত করেছেন। স্বামীজীর জীবনে অন্যান্য ধর্মাচার্যদের মতো মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর প্রগাঢ় শ্রীগুরুভক্তি, মাতৃভক্তি, ইষ্টপ্রীতি, ব্রহ্মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রানুরাগ। কিন্তু অদ্বয়তত্ত্বের মূর্তপ্রতিমা শ্রীরামকৃষ্ণের অভিন্ন কলেবর স্বামী বিবেকানন্দের এজগতে নব অবদান হলো 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' রূপ প্রত্যক্ষ দেবদেবীর পূজা প্রচলন। গুরু ও শিষ্য উভয়ের দৃষ্টিতেই জীব ও শিব, নর ও নারায়ণ সমার্থক ও অভেদ। তাই দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যদের মতানুযায়ী জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদজ্ঞান তা বর্জন করে অদ্বৈতবাদী মহাপ্রেমিক স্বামীজী তাঁর ব্যবহারিক বেদান্তের মূলসূত্রটি প্রকটিত করলেন এই উচ্চারণে –

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন-প্রাণ-শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।।
বহুরূপে সম্মুখে তোমা ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।

সর্বভূতে প্রেমময় ঈশ্বরকে দেখে সদানন্দচিত্তে জীব-জগতের সেবা করার চেয়ে অত্যধিক প্রেমভক্তির প্রকাশ আর কিই বা হতে পারে ? সেই জন্য বর্তমান যুগে প্রেমভক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে নরোত্তম স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা সগর্বে ঘোষণা করতে পারি।

পরতত্ত্বে সদালীন রামকৃষ্ণ সমাজ্ঞয়া।
যো ধর্মস্থাপনরত ত্বং বীরেশং নমাম্যহম্।।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

১। আমি মা, সকলের মা – প্রকাশক ঃ রাকৃষ্ণ মিশন, ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক।
২। স্বামীজীকে যে রূপ দেখিয়াছি – ভগিনী নিবেদিতা।
৩। শ্রীশ্রী চৈতণ্যদেব – স্বামী সারদেশানন্দ।